

শ্রীশ্রীশঙ্কর গুরুদেব

ঈশ্বর

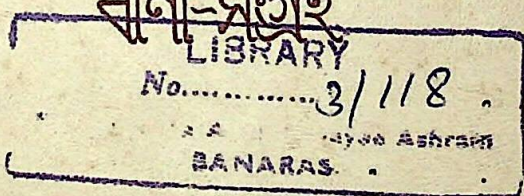
(প্রথম খণ্ড) .

31292

PRESENTED

৪

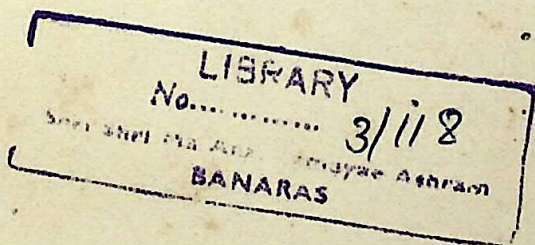
শ্রীশ্রী বালকরসাদারীর
বাণী-সংগ্রহ



শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর উপদেশ-সংগ্রহের অন্যান্য গ্রন্থ

- ১। শ্রীবীরেন্দ্রবাবী (প্রথম খণ্ড)
- ২। নির্দেশ (প্রথম খণ্ড)
- ৩। তত্ত্বসার (প্রথম খণ্ড)
- ৪। কালচার (প্রথম খণ্ড)
- ৫। চর্চা (প্রথম খণ্ড)
- ৬। নীতিবাদ (প্রথম খণ্ড)
- ৭। শূন্য (প্রথম খণ্ড)
- ৮। স্বাস্থ্যতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড)
- ৯। একমুখ
- ১০। আভিজাত্য
- ১১। অভিব্যক্তি
- ১২। আশ্রমস্ব
- ১৩। প্রশ্নঃ ?
- ১৪। ঈশোপনিষদ্, খণ্ডন ও
শ্রীমৎ বালকব্রহ্মচারীর
মতবাদ প্রতিষ্ঠা
- ১৫। কেনোপনিষদ্, খণ্ডন ও শ্রীমৎ
বালকব্রহ্মচারীর মতবাদ প্রতিষ্ঠা

PRESENTED



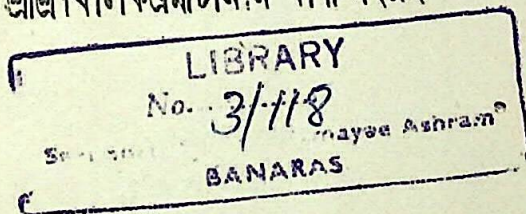
8/2/18

ঐক্য

(প্রথম খণ্ড)

PRESENTED

শ্রীশ্রীবালকরম্ভাচারীর বাণী-সংগ্রহ



শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য

শ্রীশান্তিদাস মজুমদার

শ্রীহিমাংশু ভট্টাচার্য্য

কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

সংগ্রহতন্ত্র



সাবলিমার্গ

৪৬, ভূপেন্দ্রবসু এভিনিউ

ক লি কা তা - ৪

প্রথম সংস্করণ, ১৩৬০

প্রকাশক :—

শ্রীযোগেশচন্দ্র বিশ্বাস
সংগ্রহভাষ্য পাবলিশাস
৪৬, ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ
কলিকাতা—৪

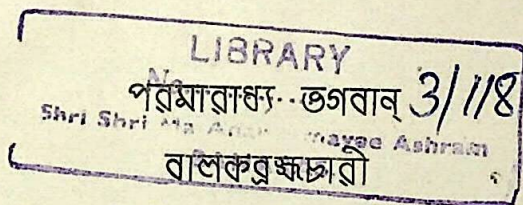
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

বান্ধাই :—
ঘোষ ব্রাদার্স
১১, বুদ্ধ ওস্তাগার লেন
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :—
শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র
এলেক প্রেস—৬৩, বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মূল্য—দেড় টাকা

PRESENTED



শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীঠাকুরের আচরণে

‘চক্রতত্ত্ব’

অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

যাদের অফুরন্ত উৎসাহ, সাহায্য ও সহযোগিতায় গ্রন্থপ্রকাশ
সহজ হয়েছে, সেই

হোমিও রিসার্চ লেবরেটরীর সত্বাধিকারীত্বে

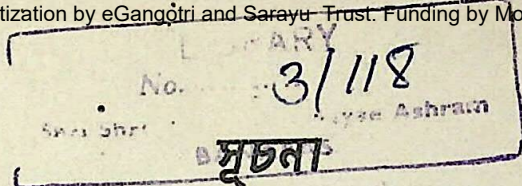
শ্রীসুবীলকুমার ঘোষ,

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

ও

শ্রীরঞ্জিতকুমার ঘোষের

কথা আজ কৃতজ্ঞাচিন্তে স্মরণ করছি



গ্রন্থভূমিকাতে বর্ণনীয় বিষয়সম্পর্কে শ্রুধীজনের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও ভূমিকাতে গ্রন্থসৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করাই বর্তমান ক্ষেত্রে শ্রেয় মনে করি। 'চক্রতত্ত্ব' পরমারাধ্য ভগবান্ বালক-ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের নিয়মিত ক্লাশে প্রদত্ত বাণীর অংশ বিশেষ। 'বীরেন্দ্রদর্শন' আলোচনাকালে একদিন বিখ্যাত দার্শনিক ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার আমাদের অনুরোধ করিয়াছিলেন যে বার্ত্তব্য ও শারীরিক অশুস্থতা নিবন্ধন ক্লাশে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে! তবে আমরা যদি তাঁহার হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বালকব্রহ্মচারীকে চক্র সম্বন্ধে ক্লাশে কিছু জিজ্ঞাসা করি এবং তৎসম্পর্কে তাঁর বাণী যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করি, তবে ডাঃ সরকার ও জনগণের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় এবং সাধনক্ষেত্রের একটা বিরাট অভাব দূরীভূত হয়। ডাঃ সরকারের কথা মত শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেদিন ক্লাশে চক্রতত্ত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি এবং তৎপ্রদত্ত সেই বাণী লিপিবদ্ধ করি, তাহাই আজ "চক্রতত্ত্ব" নামে প্রকাশ করা হইল। ইহাতে ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদির যে কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে তাহার জন্য আমরাই সম্পূর্ণ দায়ী।

মাঘীপূর্ণিমা, ১৩৬০

} শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য
 } শ্রীশান্তিদাস মজুমদার
 } শ্রীহিমাংশু ভট্টাচার্য

1638

ঐক্য

সর্বদাঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মূলচক্র বিদ্যমান। তাই যে কোন অবস্থাতে যে কোন অঙ্গ চিন্তাতে মূলকেই চিন্তা করা হয়, সেই মূলেই মূলত্বের মূল্যকে উপলব্ধি করা যায়। নাম ভেদে ভেদে যে সমস্ত চক্র বিধির বিধানের রয়েছে, তা শুধু চিন্তার সুবিধার্থে নির্দিষ্টতার মধ্যে মনোনিবেশ করে যাতে মনস্থাপন হয়, তারই বিধি ব্যবস্থা করেছেন বিধিরা। জায়গাবিশেষে গুরুত্ব দিয়ে দিয়ে চক্রগুলোর মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। যে ঘটচক্রাদির বিধি রয়েছে, প্রকৃত চিন্তাতে কি কি উপলব্ধি হয় সেই বিষয়ে জেনে নেওয়া সমীচীন। এই ঘটচক্র যে শুধু দেহেই অবস্থিত তা বললেই শেষ হবে না, এই ব্যবস্থা সর্বত্র। বিশ্বরূপের যে কোন একটি রূপে ধ্যানস্থ হলে ধ্যেয় বস্তুর সম্মুখীন হবে— চক্র সেথায়ও বিদ্যমান। সহজভাবে যাতে চিন্তার সুবিধা হয় তার জন্তই এই ঘটচক্রবিধি দেহের অঙ্গবিশেষে, অঙ্গে। যোগীরা ঐ ঐ অঙ্গ চিন্তা করে এক-এক জন এক-এক বর্ণনা দিয়েছেন নানা বর্ণে বর্ণে। বর্ণ-ভেদে ভেদে ব্যাখ্যায় না গিয়ে অঙ্গের যে-কোন একটিকে মূল চিন্তা করে তার ব্যাখ্যা করলে

প্রকৃত অর্থ তখন মিলবে। তাই মূলধার হতে সহস্রার পর্য্যন্ত যে নামে অভিহিত রয়েছে, তা হতে যে-কোন একটিকে নিয়ে আলোচনা করলে তার দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক মতে বের হয়ে পড়বে। সাধারণতঃ মূলধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিপুল, আজ্ঞা, সহস্রার—এই কয়টি নামানামির মধ্যে যোগীরা যোগ করেছেন, ধ্যানীরা ধ্যান করেছেন। বিধিদের বিধান অনুযায়ীই এভাবে চলে আসছে দেখা যাচ্ছে—যোগীরা তো যোগ করেছেন। কি ভাবে কেমন করে কোথা হতে সেই চিন্তার সাড়া দিচ্ছে, তা কি কেউ চিন্তা করেছেন? বস্তুর চিন্তা, বস্তুত্ব-উপলব্ধি, তত্ত্ব-বিশ্লেষণের বিশ্লেষণ, কি ভাবে তা সম্ভব, তা চিন্তা করার সময় করে উঠতে পারে না বা ইচ্ছা হয়ে ওঠে না বা সামর্থ্যের অভাব।

বিষয়বস্তু একটা গলাধঃকরণ করলেই হল না। বস্তুর নাম, তার উপকারিতা, তার আদি অন্ত বের করে গলাধঃকরণ করলে বস্তুত্ব সম্বন্ধে তখনই অবগত হতে পারে; এও ঠিক তাই—কি মূলধার, কি স্বাধিষ্ঠান, যে সমস্ত নামে বিভক্ত রয়েছে মূলের কার্য্যকরী সব নামেতেই অবস্থিত। আর বিশেষজ্ঞেরা তত্ত্ব বের করার চেয়েও অর্থের যত বড় স্থান দিয়েছেন, সেই অর্থবোধেই ঐ চক্রগুলোকে চিন্তা করতে সহযোগিতা করেছেন। অর্থবোধে অর্থবোধ বোধে এনে মনঃসংযোগের সাহায্যে তা প্রয়োগ করে গেছেন। অর্থবোধ একজাতীয় চিন্তার সহযোগিতা করে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুর প্রকৃত অর্থ বের করে সেই বোধে

3/118

৩

শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর বাণী-সংগ্রহ

বোধগম্য করলে বস্তু স্পর্শক অবগত হওয়া যায়। কল্পনায় তা ধার্য হলেই যত প্রকার গোল বাধে। কোনটা অর্থ, কোনটা কল্পনা, তা ধার্য হবে বস্তুতে মনোনিবেশ করলে। মনোনিবেশে যতটা একাগ্রতা দরকার, তার অভাবেই যত প্রকার 'ভাবহীন'র ব্যক্ততার প্রকাশ। মূল বিষয়বস্তুর তত্ত্ব জানা থাকলে বা জেনে নিলে মনোনিবেশের দিক দিয়ে যথেষ্ট একাগ্রতার সাহায্য করে। বস্তুর বস্তুত্ব যখন আছে, জ্ঞানার অবস্থাও যখন আছে, ইন্দ্রিয় সেই ভাবে যখন সচেতন, জেনে নেওয়া তা তো আর অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঘটচক্র গুণু কেন, জীব সর্বাবস্থায়ই সেই চক্রেতে সর্ব সময়ের জগত আছে। নামভেদ এবং ভেদাভেদ—চক্রগুলোও ঐ ভেদাভেদে নানা নামে যখন নামিত রয়েছে, শক্তি সঞ্চারিত যখন একই শক্তি হতে, গুণও সেই ভাবেই। প্রকারান্তরে বিষয়বস্তুর বস্তুত্ব একই অস্তিত্বের অস্তিত্ব। ভেদাভেদ বুদ্ধিবৃত্তিতে অস্তিত্বও সেই ভাবে স্থিতির প্রকাশ হয়েছে। চিরন্তন যোগীরাও ভেদাভেদ বুদ্ধিতে পুনঃপুনঃ যোগাভ্যাসে যোগ করে যাচ্ছেন। নবরূপের আখ্যা সম্মুখীন আবিষ্কারের উপর ধার্য হয়েছে, যোগী তখনই উপলব্ধিত হয়েছেন ব'লে বোধগম্য করেন—বোধ্যবস্তু এমনই বোধে এসে 'উপলব্ধি' নামে আখ্যা মেয়।

স্বাভাবিক মতে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী চক্রে ধ্যানস্থ সবাই। ধ্যেয় বস্তু ধারণায় এসে যোগাযোগ সূত্রের সূত্রপাতের নামটি নিয়ে যোগ আখ্যায় আখ্যাত হয়েছে। নিয়মেই বাঁধা এবং গাঁথা—যোগ ও ধ্যান, ত্বাস, প্রাণায়াম ইত্যাদি। এর পরেও বিধির

যে বিধান করেছেন ধ্যান ধারণার জন্ত, তাও সেই গ্রন্থেরই সুর। তত্ত্ববিদদের সুর আরোও সুরে আনার জন্তই সুরধ্বনির ধ্বনি, তন্ত্র, মন্ত্র ইত্যাদি সেই মূলেরই মূলমন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, ধ্বনি সেখানেই আবদ্ধ, নাদ ও বাক্যের গ্রন্থির প্রতি গ্রন্থে গ্রন্থে সেই ধ্বনিই ধ্বনিত হচ্ছে। যে সপ্তচক্র জীবগণের সুবিধার্থে 'সা-রে-গা-মা'র মতন সুর সাধবার জন্ত যে সুরকে তালে মানে এনে সুরভ্রমেতে পৌঁছার জন্ত যে সাধনা, এও ঠিক তাই। এই 'সা-রে-গা-মা'র সপ্তস্বরলিপিতে যেমন সর্বসুর গাঁথা, ঐ সপ্তচক্রেও সর্বব্যাপ্তমান সর্বশক্তি ঐ চক্রে বাঁধা, ভাষা শিখবার প্রথমে— যেমন স্বরবর্ণে ও ব্যঞ্জনবর্ণে সর্ব ভাষা যেমন গাঁথা, বিশ্বক্লেশ-এমনি ভাবে জীবলোকে বাঁধা। রূপের পরিচয় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের মতন; এখন সংযুক্ত ভাষা ব্যবহারের উপর করছে নির্ভর। এই যুক্ত সর্ব অবস্থাতেই আবদ্ধ—মূলাধার হতে সহস্রার অবধি যে সুরে বাঁধা আছে, বিশ্লেষণে তার আদি অন্ত বের হয়ে আসবে।

চক্রের বিবরণ—সর্বচক্র একই বিবরণে বর্ণিত; তাদের কার্যকলাপ পদ্ধতি একই ধাঁচে গঠিত। চক্রে মনোনিবেশ, মনঃসংযোগ ও নিরোধ অবরুদ্ধের অবিরোধিতা, তবুও বুঝবার উদ্দেশ্যে মনোনিবেশ ও একাগ্রতার নাম প্রতি মুহূর্তে ব্যবহৃত হবে। তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আল্লাপ ও আলোচনা সেখানে সমাপ্ত হয়ে পড়ে। ভেদাভেদ বাইরের দৃষ্টিতে যখন রয়েছে, সংযম, একাগ্রতা, স্থিরতা ও অস্থিরতা

৫ শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর বাণী-সংগ্রহ

এসব নিয়ে আলোচনা করা স্বাভাবিক। এখন যে বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছে, সেই চক্রসম্পর্কে তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে চক্রের মনঃসংযোগ চির আবদ্ধে অবরুদ্ধ ; তবুও বার বার মনঃসংযোগ কর, একীভূত কর, তবে হৃদিসে আসবে। তত্ত্বের দিক দিয়ে দিশে আছি সেটাই চিরন্তন। 'হৃদিস' আর 'বেদিশ' নামে শুধু ধার্য্য এবং দুই-ই দিশেরই দিশ, ব্যবহারিক চিত্তবিন্দিপুকে চিত্তস্থিরে পরিণত করা। সেই পরিণতির দিক দিয়ে এলে চক্রে মনঃসংযোগের সংযোগ হলে, মনোনিবেশ হলে সবই আসবে সেই বশে ; তত্ত্বের দিক দিয়ে গেলে বশে এসে রয়েছে সৃষ্টির সাথে সাথে। শাস্ত্রগত চক্রের আখ্যা ও ব্যাখ্যা এবং নানা নামভেদে ; যেমন ইড়া, পিঙ্গলা, শুষুম্না, বজ্রনাড়ী, ব্রহ্মনাড়ী, আবার 'ক' হইতে 'ং' পর্য্যন্ত রয়েছে, আবার যন্ত্রগুলো পদ্মের পাঁপড়িতে পাঁপড়িতে নানা রঙ্গবেরঙ্গে রয়েছে—এই ভাবে নানা কারিগুরির নানা তুলির টানে painterরা* paint করে রেখেছেন।

বিশ্বরূপের রূপই যদি পরিচয় হয় নানা বর্ণ ও রঙ্গবেরঙের নানা অবস্থা সুপ্ত অবস্থারই সুর ও পরিচয়। সুতরাং পদ্মের পাঁপড়িতে রঙ্গবেরঙ্গ আর নাড়ীতে ব্রহ্ম ও বজ্রনাড়ী ভাবারই শুধু মারপ্যাচে থেকে বুঝের পক্ষে অস্থবিধার সৃষ্টি করছে ; চক্রের অন্তর্নিহিত অণু তথায়ও চক্রনামে ধার্য্য করছে। সেই সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত সর্ববর্ণ রঙ্গবেরঙের অক্ষরমাফিক

* তত্ত্ব-শিল্পীরা।

চক্রতত্ত্ব

৬

পরিচয় দিচ্ছে এই বিশ্বরূপের ভেতরে। সহজলভ্য বস্তুকে ছল্লভ করার কোন অর্থ নেই; এই ছল্লভ অবস্থায় পরিণত হওয়ার জন্য কোন অবস্থা দায়ী? বুঝে যদি অবুঝ বেশী থাকে কার্য্যকরী, সে ভাবেরই নির্দেশ অনুযায়ী নির্দেশ আসবে, 'যদি'র পর্য্যায় যদি ধরে নেওয়া যায় আর প্রচেষ্টা প্রবলভাবে আছে—তবে শুধু বিরোধিতা। এই বিদ্রোহজাতীয় ভাষণ বের হবে। আর বিচার্য্যে যদি প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিশ্বরূপও নানা বর্ণরূপেতেই তাদের পাবে। মাংস ভক্ষণে ইচ্ছুক নিজকে ভক্ষণ করলে যে অবস্থা, তত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বিকৃততত্ত্বে এলে বিক্রীত করে নিজকে। আবার তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে একজাতীয় সত্য সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই, এক জাতীয় ভাষণ সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এর আগেই বলা—ভেদাভেদ বুদ্ধি যখন রয়েছে, পার্থক্যবোধ যখন আছে, বাহ্যিক দৃষ্টি যখন রয়েছে, সেই দিক দিয়ে যদি চিন্তা করা যায়, তবে ভেদাভেদ হিসাবে সব হবে; তাই চিন্তাও করছে দেহের চক্র-হিসাবে, যা শাস্ত্রগত রয়েছে। এখানে বিবাদের কোন কথাই আসে না। যারা একটু চিন্তাশীল ও তত্ত্বজ্ঞ, তাঁরা সন্মুখীন সন্মুখে যা লব্ধ হয়, তা দিয়েই তার তত্ত্ব বের করে জিজ্ঞাসুদের পিপাসা নিবারণ করেন; তাই সপ্তচক্রের এখন হ'ক আখ্যা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন একটি চক্রের দ্বারা আবৃত,

BANARAS

বিবৃতিতে এলে এখন আবৃত্তি করতে হলে ঐ চর্যটিকে বাদ দিলে পরবর্তী রচনায় যে বিষয়বস্তু রচিত হবে, বস্তুর বস্তুত্ব পর পর পরিবর্তনের মাঝে নানা রূপের রূপ বিকাশে বিকশিত হবে। রূপের সংজ্ঞা সঙ্গ হতেই উদ্ভব। রূপগুলো সুসজ্জিত ভাবে মালা (garland) মাফিক সজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। রূপাণু অণুতে প্রতিষ্ঠিত, অণুও রূপ ছাড়া নয়। তারের যন্ত্রের একটির পর একটি তার যেমন সুসজ্জিত থাকে, একটি শব্দে সব তার যেমন বাজত হয়ে ওঠে, তাতে যেমন সব তারেতে সুর বিद्यমান, ঠিক তেমনি অণুর পর অণু, রূপের পর রূপ সর্বগুণে গুণান্বিত হয়ে সুসজ্জিত ভাবে রয়েছে ঠিক তার-মাফিক। মূল তারের একটি শব্দে যেমন সম্মিলিত সুরের ধ্বনি বাইরের দৃষ্টিতে যা যা দৃষ্টি ও গ্রাহ্যে রয়েছে মূল তারের শব্দের শব্দ মতন। বাইরের আচরণ, ভাব, ভঙ্গি যা উপলব্ধির সেই সুপ্ত অণু সুসজ্জিত তারের মতন সুর দিচ্ছে নানা হাবভাব ভঙ্গিমার ভেতর দিয়ে সম্মিলিত ভাবে। এই সঙ্গীতের মিলিত সুর সমভাবে সুর দিচ্ছে, ধ্বনিত হচ্ছে বিশ্বরূপে রূপের মাঝে; চিন্তা, মন, ইন্দ্রিয়ও ঠিক তেমনি ভাবে সেই সাড়ারই সাড়া দিচ্ছে। তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার্য্যে এই পরিণত হয় যে, জীবঙ্গ জীবলোকে সুরজ্ঞে সুপরিচিত ও বিরাজিত, তবুও ব্যবধানে সবই করছে ব্যবধান। ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ এই আখ্যায়

চক্রতত্ত্ব

৮

ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেইভাবেই কথোপকথন এখন হচ্ছে—বিচার্য্যে পূর্ণত্বে আছি। এখন অপূরণত্বেতে ব্যবধানে যখন পূর্ণকে অপূরণ ভাবে ভাগাভাগি করা হয়েছে, এখন সম ও লয়ে আবার গিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, এ হল ডাল চালে মিশিয়ে পুনঃ বেছে নিতে হবে। কাজটি হল—যাহা ছিল তা মিশিয়ে আবার পৃথক্ করছি। এখন বাছা যাক্—শুধু ডাল ও চাল, না আরও কিছু মেশান আছে ; সরিষা থাকলে ত কথাই নেই, পৃথক্ করা যাবেই, একদিনে না হউক আর তা না হয়ে বাছতে বাছতে চিরন্তনের পথে এগিয়ে না হয় চলতে হবে। এখন কোন চলায় যে চলছি, সেটাই বিবেচ্যের বিষয় ; তবে চালক যদি ঠিক থাকে, বাছার জন্য ছাঁকনিও ঠিক সেই ভাবে তৈয়ারী করে নিয়ে আসবে, ঠিক পদার্থ-গুলোকে তখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঠিক মত রেখে দিতে পারবে। জ্ঞানরূপ ছাঁকনি দ্বারা সবকিছুকে ছাঁকতে গেলে রূপগুলো যার যার ঠিকে এসে পড়বে। সেই অণুবীক্ষণযন্ত্রটি আমাদের এখন ব্যবহার করতে হবে ; তাতে কোথায় কোন রূপ স্তূপ অবস্থায় লুকিয়ে রয়েছে, বীক্ষণে তা ধরা পড়বে—উপযুক্ত হিসাবে তখনই গ্রাহ্য এবং অগ্রাহ্য গ্রাহ্যেতে আসবে। গ্রাহ্য, অগ্রাহ্য প্রকারান্তরে একজাতীয় গ্রাহ্য, ব্যবহার্য্য বস্তু একভাবে না একভাবে একজাতীয়তে না এক জাতীয়তে হচ্ছে। জাতি যদি এক হয়, জাতীয়তা

শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর বাণী-সংগ্রহ

তা ছাড়া নয়—চৈতন্য সেইখানেই বিদ্যমান। চৈতন্য একই শক্তি হতে 'আবির্ভূত'। সেই ভূতে 'পঞ্চভূত' নামে হল অভিহিত। ভূত অগণিত, ধার্য্য যতটুকু গণনাতে এসেছে। এই পঞ্চভূতে গড়া দেহ সর্বভূত লুক্কায়িত এই ভূতে। যাক্ সে কথা, এখন ব্যবহারিক চক্রসম্পর্কে হবে কথা, বার বার বলতে গিয়ে ঐ কথাটি হারিয়ে যাচ্ছে। তবে মনোনিবেশ করলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ একাগ্রতায় যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই চক্রের অণুগুলো একাগ্রতার পরিচাপে জলে সাবুদানা মাফিক ফুলে উঠে একজাহ্নবী অবস্থা হয়ে ওঠে, সেটা হল বীজে মৃত্তিকাসহ জলদান ; তাতে যেমন অঙ্কুরের উদ্ভব, এও ঠিক তাই ; অণুপরমাণুর চক্রেতে মনোনিবেশ করলে বারিসঞ্চারের মতন তাতে তাদের প্রাণ সঞ্চার হতে আরম্ভ হয়। প্রাণ বহু প্রাণের সমষ্টি, পঞ্চভূত তো তারই প্রমাণ। পঞ্চভূত প্রাণ ছাড়া নয়, প্রাণেই প্রাণীর বিকাশ আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। যাক্ তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঐ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলো মূল তারের যে শব্দ, সেই সম্মিলিত ধ্বনি যেমন ঐ অংশগুলো দিয়ে যাচ্ছে, এই মনোনিবেশে যে শক্তির বিকাশ ও সঞ্চার হচ্ছে, সম্মিলিতভাবে সেই অংশগুলো সমভাবে মিলিত করে ঐ একই শক্তির করছে বিকাশ—'একাগ্রতা' নাম সেখানেই হয়েছে। ধার্য্য ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব সেখানেই হ'ল। মূল শব্দের ধ্বনি মিষ্টত্ব-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সম্মিলিত ধ্বনি-

চক্রতত্ত্ব

১০

গুলোর ধ্বনিতে। ইচ্ছাশক্তির প্রভাব সেই ভাবে হয়, যদি সুরে থাকে বাঁধা। মনোনিবেশেই কার্যপদ্ধতি ও প্রথা সেখানে হয় ব্যবহৃত। চিন্তার একাগ্রতার সাথে সাথে তাপে ধান দিলে যেমন ফুটে উঠে, একাগ্রতার তাপ যখন অণুপরমাণুতে দেওয়া হয়, তেমনিও ঐগুলো ঐ জাতীয় ঐ ভাবে বিকশিত হয়ে উঠে বা ফুটে উঠে, রূপে এমনি হয় রূপান্তরিত একই রূপে, একই রূপ বিद्यমান ঐ প্রস্তুটিত অবস্থায়, ক্রমশঃ ক্রমশঃ আবহাওয়ার চাপে ক্রমবিকাশে পরিণত হয় ও চাওয়া-পাওয়ার মাঝে যেমন চলতে থাকে, তারপরেই যেমন পরিণত হয় বীজে, অণুগুলো ঠিক তেমনি উঠে চাওয়া-পাওয়ার মাঝে একাগ্রতার চাপে। যে মূল চিন্তাতে এগিয়ে গিয়ে সুরধ্বনি নিয়ে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করা হ'ল ধ্বনিকে অনুসরণ করে। তারপরে সুরজ্ঞ রূপ বীজে যেমন পরিণত হয়, ঠিক তেমনি বীজ উৎপত্তিতে বীজ প্রাপ্য, জীবলোক সেই আলোকে হয় আলোকিত যে আলোক হ'তে আবির্ভূত, সাধনায় গিয়ে গিয়ে সেখানেই আবার পরিণত। যেই ব্রহ্মবীজ জীবলোকে অবস্থিত আবার বহুবীজে তা হতে পরিণত; বীজ বীজ হতেই উৎপত্তি, তারপর একাগ্রতা ঐ সমস্ত অণুগুলোকে এমনি ভাবে বাড়িয়ে তুলতে থাকে, তখন একাগ্রতায় সব অণুই হয় একে রত—একমুখী—ধ্যানে সব অণুই অনুসরণ করছে ঐ অনুযায়ী। বাহ্য ইন্দ্রিয় নামে যে গ্রাহ্য, অন্তর্নিহিত

এবং পরবর্তী অণুপরমাণুতে এই একই জাতীয় ইন্দ্রিয়
 সেখানেও বিদ্যমান রয়েছে, সর্ব অণুতে সেই সুর এবং
 সাড়া রয়েছে, তারাও সেই সাড়ার জ্ঞাত এগিয়ে চলছে ;
 পরিশেষে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকে সুরওয়াল হইয়া গেছে,
 মূল প্রত্যেকটিতে বিদ্যমান রয়ে যাচ্ছে। 'সম্মিলিত' এখন
 মূলে হল প্রতিষ্ঠিত, তারই আবার সম্মিলিত সুরের
 একটা সুর—এই ভাবে চলছে একের পর এক। সাধা,
 সাধনা, মনোনিবেশ ঠিক এমনি ক'রে সাথে সাথে এগিয়ে
 চলছে, তাদেরও বিভ্রাম নেই ; তারা মূল দেখবার জ্ঞাত
 ব্যতিব্যস্ত হইয়া এগিয়ে চলছে—মূল কোথায় ? তারা সেখানে
 গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ও উপবেশন ক'রে সেখানে মূলকে
 অবগত হয়। আবার দেখা যাচ্ছে সম্মিলিত রয়েছে 'স্বসজ্জিত'
 ভাবে। অন্ত যেখানে আবার আরম্ভ সেখানে, অন্ত ও আরম্ভ
 একই সূত্রে আবদ্ধ, অন্ত আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোন
 অন্তরালে অন্ত যে লুকিয়ে আছে, সাধকরা সাধতে সাধতে
 বেদিশ হইয়া যাচ্ছে। তাই মনে হয় জীবলোকে জীবগণ
 বিক্ষিপ্ত খাতায় নাম লিখিয়েছে। খোঁজা মনে হয় শেষ
 হয়েছে, তাই খোঁজায় পরিণত হয়েছে। তাই লজ্জাস্বরম
 নেই, কোনটাতেই নেই শরম, আচরণেও কোন আপত্তি নেই,
 নিবারণের কোন বালাই নেই ; এখন যে ইন্দ্রিয়ের অবস্থা
 আজ যে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, সেই অবস্থা। 'আছি রে'
 বলছি 'আছি কিনা', 'নাইরে' বলছি 'ঠিক কিনা',

‘পেয়েছি’ বলছি ‘পাব কিনা’, ‘স্থিরতারে’ বলছি ‘স্থির কিনা’—কোন ঠিকের মাঝে আজ রয়েছে, তাই ভাবনাওয়ালাদের ভাবিয়ে দিয়েছে। ভাবুকরা এখন বসে বসে ভাবের ঘোরে বিভোর হয়ে টান দিচ্ছে। প্রাপ্তির বেলায় নেশা-মাফিক পাচ্ছে, না বিকৃত মাফিক পাচ্ছে, না আলাপেই হচ্ছে, সেটা যার যার বিভোর ও তন্ময়তার উপর নির্ভর করছে—বিচার্য্য সেখানেই ধার্য্য পরিণত হচ্ছে। চ্যুতদের বেলায় গরমিল হয়ে যাচ্ছে। যাক্ সেকথা। তারপর অণুগুলো ক্রমবিকাশে বিকাশে ঠিক চুম্বকের মতন এমন চুম্বকত্বের অবস্থার মতন হয় যে, ঐ অংশগুলো এমন একজাতীয় আকর্ষিত শক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, আকর্ষণ একজাতীয় অবস্থায় আকর্ষণকারীর মতন আকর্ষণ করে চলছে। ঐ আকর্ষণ পরিপূর্ণের জন্য এই প্রাকৃতিক ও আবহাওয়া হতে ঠিক সেই অনুযায়ী শক্তিগুলো পরিপূর্ণ হতে থাকে; যেমনি জীবলোক জীবে পরিণত হয়েছে তেমনি সেই সূক্ষ্মত্রে আরও শক্তি সেই জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে থাকে, প্রত্যেকটি কেন্দ্রে কেন্দ্রে তেমনি ভরপুর হয়ে চলছে। মনোনিবেশকারীরা নিবিষ্ট ভাবে ঐ সকল চক্রতে মনোনিবেশ করে দেখতে আরম্ভ করলো। এখন মনোনিবেশকারীরা ঐগুলোকে প্রতিবেশী হিসাবে পেতে আরম্ভ করলো। প্রতিবেশী খুঁজতে গিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করে এসে দেখলো বাড়ীর পাশে। এখন চলছি লঙ্ঘন করতে, তারপর বাড়ীর পাশ, তারপরে না পেরে হবে উপহাস। এখন ত করছি

১৩

• শ্রীশ্রী বালকত্রক্ষচারীর বাণী-সংগ্রহ

উপবাস। অবস্থাগুলো শুধু আলোচনা করা হচ্ছে। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের মনোনিবেশে যখন অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় এবং সেই অন্তর্নিহিত বস্তুর বস্তুত্ব যখন জানতে পারে—সেখানেও এই বাহ্য ‘আমি’, সেই বস্তুতে এই ‘আমি’ গিয়ে উপবেশন করে। ‘আমি’ সর্বত্র বিরাজমান; যেখানে বস্তুর বস্তুত্ব, সেখানে ‘আমি’ সর্বত্র। ‘আমি’র সাথে যাবতীয় যা কিছু সবই একই অবস্থায় অবস্থিত। আর এক ভাবে যদি এটাকে বিচার করা যায়, তা হ’লে এই বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি, বুদ্ধিবৃত্তি যা-কিছু রয়েছে, একাগ্রতায় সবগুলো কঠিনতম হয়ে এই একাগ্রতায় যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যার উপর ও যে বস্তুর উপর ঐ কঠিনতম মন স্থাপন করা হয়, সেই বস্তু তখন চুম্বকত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সেই বস্তুতেও এই বস্তু একই শক্তিতে আবদ্ধ হয়—এই ভাবে ভাবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চলছে আর সত্তাও চলছে, সেখানেও জীবের বাহ্যিক সত্তা; বর্ণভেদগুলো হ্রেশনে যাওয়ার মাঝের পথগুলো, যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে রঙ্গ বেরঙ্গের ভাবাভাবির সাথে ভাব হয়, বিশ্বতালিকায় তার নমুনা রয়েছে। ঐ নমুনা দিয়ে ঐ নমুনাকে অনুসরণ করে যার যার আহাৰ্য্য বস্তু জুটিয়ে নিচ্ছে, খরিদ করার সক্ষমতা যার যার সক্ষমতার উপর নির্ভর করছে। তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সক্ষম চিরন্তন। এখন বিন্ধেপে আসা হয়েছে কিনা, আক্ষেপের বেলায় এই আখ্যাই সাময়িক ধার্য্য হয়ে রয়েছে। বস্তুত্বের অর্থের দিক দিয়ে যা সত্য

তা ঠিকই রয়েছে। মূলধার হতে লহস্রার নামে যে অভিহিত এইখানে সবই একই স্তরে আবদ্ধ ; বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন নাম বিভিন্ন অর্থবোধে হয়েছে আবদ্ধ, রঙ্গবেরঙ্গীরাও সেইভাবে রঙ্গ মিলন্তির খেলা খেলছে। তাই রঙ্গবেরঙ্গের বহু রকম ভাবাভাবির মত ভাব বানিয়ে ভাষণে ব্যবহৃত করছেন যারা, এ পর্যায়ে আছেন তাঁরা। তত্ত্ববিদরা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হিসাবে এগিয়ে চলেছেন তত্ত্বের দিকে—অর্থবোধে চিন্তা, কল্পনা করে চিন্তা, বস্তু দর্শিয়ে চিন্তা—এক-একটি এক-এক অবস্থা। এখানে নির্ভর করছে confidence-এর আস্থার উপরে, confidence প্রত্যক্ষের উপরেই হয়। ঐপ্রত্যক্ষে যে আস্থা স্থাপন করা হয়, তা আস্থাতে থাকে না। তাই প্রত্যক্ষের অনুভূতিতে যে অর্থবোধে চিন্তা করা হয়, গুণবিশেষে কার্যক্ষমতাও সেই সেই ভাবে হয়ে আসে ; যেমন ‘আজ্ঞা’ নামে যে চক্র, তাতে মনঃসংযোগ, সূর্য্যতেজ তাতে যেমন মগ্ন বস্তুর প্রত্যক্ষ তেজসম্পর্কে জ্ঞাত অর্থবোধও সহজ, আর চিন্তাতে তা স্বাভাবিক অবস্থা। এই আজ্ঞাচক্রে এই তেজঃপূর্ণের জ্যোতির চিন্তাতে ধ্যানস্থ হলে চক্রের সমস্ত সূক্ষ্ম অংশগুলো ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঐ তেজঃপূর্ণ অবস্থায় পরিণত হতে থাকে, অবশেষে ঐ একই অবস্থায় পরিণত হয় ; তেতর ঐ তেজের আলোতে আলোকিত করে ফেলে, তখন ‘সাধক’ আনন্দে তন্ময় হয়ে যায়। বাহিরেও কিন্তু ঐ একই দৃশ্য। জীব অভিভূত হয় স্বভাবতঃ বাহ্যবস্তুর সাড়ার

সহিত এক সাড়া দিলে। বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে যা যা আছে বা সন্মুখীন হয়, অন্তর-ইন্দ্রিয় যদি একই সাড়া দেয়, তবেই সাধক তার সাফল্য মনৈ করে। বস্তুতঃ সাফল্য-মণ্ডিত অবস্থায় জীব বিরাজ করছে। জীব যেমন চিন্তা করতে করতে তার কায়া বদলে ফেলে এমন অনেক প্রমাণ আছে, তেমনি সাধক সাধ্য বস্তু চিন্তা করতে করতে তেমনি তাকে করে ফেলে। জায়গাবিশেষে দেহের কতগুলো যেমন sensitive parts আছে, তাতে স্পর্শে একটু অস্বাভাবিক যেমন লাগে, এই sensation সর্ব ইন্দ্রিয়ের কাছে সর্ব ইন্দ্রিয়, তাই চিন্তার সাথে ঐ সমস্ত sensitive partsএর একটা sensation উদ্ভব হয়, ঐ sensationই সৃষ্টিতে পরিণত হয়। সৃষ্টিও বহু ভাবে বহু প্রকারে আছে। শুধু সম্ভান উৎপত্তিই সৃষ্টি নয়। চিন্তা করা, কথা বলা, শ্রবণ, ভ্রাণ, উপলব্ধি, অনুভূতি যা কিছু আসছে ঐ সৃষ্টিতেই পড়ছে—এখানেই ‘প্রকৃতি’ ও ‘পুরুষ’ নাম নিয়েছে। দুই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই সৃষ্টি। বুঝবার জন্য এই নাম শুধু। দুই-ই আবার এক শক্তিতে বিদ্যমান রয়েছে। মুক্তি, নির্বাণ, ভক্তি, জ্ঞান সবই ঐ একই মিলনের ফল—যোগ এখানেই কার্যকরী। যোগ ইচ্ছা হইতেই আবির্ভূত। যেখানে যোগ সেখানেই সৃষ্টি। কায়া পরিবর্তনের ক্ষমতা যখন কায়াতে বিদ্যমান, তার পক্ষে সবকিছু করাই সম্ভব। সেই শক্তি যখন জীবলোকে প্রত্যেক জীবই বর্তমান, ভবিষ্যতে এই একই

চক্রতত্ত্ব

কার্য্যকরী হবে। এই বিরাট রূপও যখন তার মধ্যে অবস্থিত, একটু শক্তির প্রকাশেও যা বিরাট শক্তির প্রকাশ একই কথা, শুধু ক্রমবিকাশের সাপেক্ষ। শক্তি যখন আছে, সফলতা অনিবার্য্য। আবার এও একজাতীয় ভাষণ হতে পারে যে, সর্ব্ব-অবস্থাই মুক্ত অবস্থা—করলেও ‘আচ্ছা’ না করলেও ‘আচ্ছা’—এইটুকু বুঝে নেওয়া দরকার। মনের গতিবিধিতে যখন বুঝ-অবুঝে বাড়াবাড়ি বা কমাকমি, সেই ভাবে যখন তারতম্যতা, সাধনাও সেই ভাবে হওয়া উচিত সবকিছুকে যেন রাখতে পারে নিরপেক্ষতায়। সৃষ্টি স্থিতির একমাত্র চিন্তাই পথের পাথের। সেই চিন্তাতে নানা পরিবর্তন, ভালমন্দ তাতেই, ব্যবহারিক দিক দিয়েও তাই। শাস্ত্রগত উত্থানপতন চিন্তার প্রভাবেই। মনকে এমন অবস্থায় রাখা সমীচীন ওর ইচ্ছায় যেন হয় চালিত—নিরপেক্ষ এই ক্ষেত্রেই হয় অভিহিত। এই নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি আরছে আনা যায়, বস্তুতে বস্তুত্ব যদি জেনে নেওয়া যায়। প্রকারান্তরে জানাজানি একভাবে না একভাবে হয়েই যাচ্ছে। মন ধ্যানস্থ অবস্থায় সর্ব্ব সময় রত, চিন্তা যুক্তি মন কেন্দ্রসমূহতেই অবস্থিত। কেন্দ্রেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ-সমূহের স্রমষ্টি—অণু তথ্যই, চক্র তাতেই। তাই যে কোন অবস্থাতে যা হয়ে যাচ্ছে, যত দ্রুত গতিতেই মনের গতি যাক্ না কেন, অণুগুলো সেইভাবে সেইভাবে সুসজ্জিত এই অণু চক্রতেই অবস্থিত। চক্র দেহেতে ব্যবহারিক হিসাবে

১৭ শ্রীশ্রীবালকরক্ষচারীর বাণী-সংগ্রহ

যে যে নাম দিয়ে কাজের সুবিধার্থে বুঝিয়ে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে, সেই সপ্তচক্র মূলধার হতে সহস্রার অবধি একই নাড়ীতে সংযুক্ত। তবে সর্ব চক্রই সর্বদিকে সর্বান্তে 'ব্রহ্মনাড়া' নামে অভিহিত ঐ নাড়ীতে সংযুক্ত। অঙ্গবিশেষের বিশ্লেষণ করতে হলে সেই ভাবেই বর্ণ বিস্তার করতে হয়। মূলধারে শাস্ত্রগত যে সমস্ত ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ রয়েছে, ঐ আধারে মনোনিবেশ করলে মনানুযায়ী যা যা প্রয়োজন তা-ই মিলে—এ যেন এক 'বাঞ্ছাকল্পতরু'। জায়গাবিশেষে যাচ-এগ করে যার যার কার্য্য দোহন করে নিচ্ছে; যেমন গো-অঙ্গে যাচ-এগ অনুযায়ী সবই কার্য্যে লাগে, সম্মুখ হতে পেঁছন অবধি সবই যেন চাহিদার মধ্যে রয়ে গেছে। মনঃশুদ্ধি গোময়, গোমূত্র শুদ্ধি, জীবনধারণে দুগ্ধপান, পূজোর ঢাকি মাগলো তার চর্মটি—সর্বদাই তার প্রয়োজনে এল। ঠিক মনানুযায়ী যা যা প্রয়োজন সেইভাবে চাহিদাগুলো মিলছে। মূলধারে যা চাহিদা, মনানুযায়ী তা মিলাতে যাচ্ছে,—প্রথম মিলছে, "Too difficult"; তারপর "সময় সাপেক্ষ"। মনোনিবেশ করে এই হতাশ নিরাশকেই চাহিদারূপে চক্র হ'তে দোহন করছে এবং influence স্থাপিতানেও আছে, মণিপুরেও আছে, অনাহতে আছে, বিশুদ্ধে আছে, আজ্ঞাতেও একই সুর দিচ্ছে, আবার অনুভূতির বেলায়ও পাওয়া যায় যে-রঙ্গবেরঙ্গের ভেবে নিয়ে মনোনিবেশ করছে, সেই ভাবেই রং মিলতি পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটা চক্রের একটা কেন্দ্রে

চক্রতত্ত্ব

১৮

নানা অর্থবোধে মনোনিবেশ করে এক-একটি অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রকারান্তরে ঐ চক্রগুলো যেন একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠানের কার্য করে যাচ্ছে—মূর্তিতে বিরাট কল্পনা, এর বেলাও ঠিক তাই, কল্পনায়ও বিরাট করতে পারছে না, যে বিরাট অণুতে ও চক্রতে রয়েছে; সুতরাং কল্পনায় যে আখ্যা দেওয়া হয়, তাও তা ছাড়া নয় কিন্তু অর্থবোধে আনে সত্য, কিন্তু Confidence নেই বলে সেই বোধগুলোও আস্থাবিহীনের দেয় সুর। তাই একাগ্রতা আস্থাহীনে গিয়ে ঐ আস্থাহীনতারই বৃদ্ধি করছে এবং এর প্রভাব সর্ব অণুতে প্রতিফলিত হয়ে পড়ে, তাতে ফলাফল ঐ জাতীয়তার মধ্যে রয়ে যেতে থাকে। তাই বস্তুত্বের অর্থবোধও যাতে আস্থা-বোধে আসে এবং ঐ আস্থাই সর্ব কার্য সুগম ভাবে করিয়ে দেবে। তখন যে কোন কঠিনতম অবস্থা সহজসাধ্য হয়ে যাবে। যে-কোন বস্তুত্ব মনঃসংযোগ করলে তার চক্রেতেই যখন করা হয়, সেই বিষয়বস্তুর সম্পর্কে জ্ঞাত থাকলেই সেই অর্থবোধের বিরাট চিন্তাতে মনও সেই জাতীয় অবস্থার পরিচয় দিতে থাকে। এর আগেই বলা—যা আছে তা-ই জাগিয়ে তোলা—এ হলো এক জাতীয় অবস্থা এবং ব্যবধান ও পার্থক্যবোধে যা পার্থক্য বোধ মনে হচ্ছে এবং ‘জ্ঞান’ ও ‘অজ্ঞান’ নামে যখন অভিহিত রয়েছে, ‘জানা ও অজানা সেই পর্যায়ে পড়ছে। চাওয়া ও পাওয়ার প্রশ্ন

তা হতে বাদ যাচ্ছে না। সুতরাং ব্যবহারিক আত্মতৃপ্তি নিজস্ব তৃপ্তি, সুখ-সুবিধার্থে সাধনা ও ধ্যান ধারণা সে ভাবেই সমূহ তৃপ্তির ভাগিদেই এগিয়ে চলছে আরও গভীর তৃপ্তির দিকে। তৃপ্তি বা আনন্দ, চিদানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ যা হোক সবই ভাষাতে নামেতে রয়েছে। বস্তুতঃ আনন্দের আভাষ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে যতটুকু পাচ্ছে সেই সুখ ভোগের উপর নির্ভর করে ঐ সমস্ত বৃহৎ ভাষার প্রয়োগ। বস্তুত্বের তত্ত্বসম্পর্কে মানে বুঝসম্পর্কে কতটুকু বুঝে এসেছে সেই বিষয়ে সন্দেহ।

যে-কোন বিরাট চাহিদার পূর্বাভাষ বাহ্যে যখন পরিচয় দিচ্ছে এবং সাধনাও সেই পথে অবস্থান করে সেই সেই ভাবে তা নিয়ে এগিয়ে চলছে সেই দিকে। তাই বিষয়বস্তুর যে-কোনকে অবলম্বন করে আত্মতৃপ্তির তৃপ্ত্যর্থ বস্তুকে অবলম্বন করেই সেই বিরাট বস্তুর সম্মুখীন হচ্ছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্থূল, সূক্ষ্ম, বিরাট নানা নামভেদে ব্যবহৃত; তবে তার রূপ ভাষায় প্রয়োগ করতে গেলে আর ব্যবহারিক ভাষার সহিত তার সমতা আনতে গেলে ঠিক সমতা রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ে। ব্যবহারিক বিষয়বস্তুর সাথে ঐ বস্তুত্বের অসামঞ্জস্য হয়ে পড়ে; তাই আলাপের প্রতি যুগুত্বই থাকে খেয়ে খেয়ে চলতে থাকে। তাই 'ব্যবহারিক' নাম দিয়ে জিনিষটাকে একটু হৃদয় করে নেওয়া হয়েছে। • প্রাকৃতিক নিয়মে সমস্ত বস্তুই সূক্ষ্ম ও স্থূল—অনেক আগেও একথা

বলা হয়েছে। এই স্থূল সর্বত্র বিরাজমান, যেখানে নির্বাণ, মুক্তি, কিংবা চিদানন্দ সেখানেও এই সূক্ষ্ম বস্তু এবং বস্তুতেই চৈতন্য যা কিছু হচ্ছে চেতন ছাড়া নয়। প্রত্যেকটি অবস্থা চেতনে সংযুক্ত, চেতনই তা চৈতন্য করে দিচ্ছে; চৈতন্যে সর্বাবস্থাই যে ভরপুর। যেখানে মিশে যাচ্ছে, পরে ভাবে ব্যক্ত চৈতন্য সেখানেও কার্যকারী হয়ে যাচ্ছে। কে ব্যক্ত করলো? কে মিশে যাওয়ার আভাষ জানালো? এত বেশী দ্রুত গতিতে কাজে পরিণত হয়ে যায়, মিশে যখন যায় এবং বলে তখন খেই হারিয়ে ফেলে যে আর কেহ এগুলো বলাচ্ছে বা বলাচ্ছে কিনা—যেমন চক্ষুতে কুটা পড়া, মনে হয় যে চিন্তার আগেই চক্ষু মুদ্রিত হয়ে যায়, তা কখনও হতে পারে না; বলা যেতে পারে আমি ত ভাবিনি—কখন চক্ষু মুদ্রিত হলো? মুদ্রিত কে করালো তা চিন্তা করলে পরিষ্কার হয়ে যায়। এমন অনেক গতিবিধি আছে—হাঁটা চলার ভেতর দিয়ে এবং balanceএর ভেতর দিয়ে এবং কি শিশু, কি বৃদ্ধ, বুঝে বুঝে তার নিজস্ব কায়াকে অবস্থার অবস্থায় নিজের গতিকে এদিক্ ওদিক্ করছে; সহজলভ্য ও সহজসাধ্য হয়েছে বলে জিনিষের দামই দিতে পারছে না। বস্তুতঃ অন্তরালে চৈতন্য কার্য করে যাচ্ছে এবং তার instigation চালিত হচ্ছে—আবার চৈতন্য ও চেতনার দ্বারা চালিত চেতনাও তথৈবচ। এই ভাবে এই ভাবে

আদানপ্রদানে একসমুতা বজায় রেখে চলে যাচ্ছে—বহু আগেও একথা ক্লাশেএ বলা হয়েছে, তাই মাঝে মাঝে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য ~~কল্প~~ প্রয়োজন। চৈতন্য বস্তুটি কি? একটা গতির নমুনাবিশেষ; গতিতে দৌড়াতে গেলে যেমন তার হাত পা অঙ্গভঙ্গি যেমন সেই মাফিক হয়ে পড়ে এবং হয়ে যায়, ‘গতিতে’ জীব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে বলেই গতির গতিতে কায়াতেও সেই সেই ভাবে নানাপ্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গতে নানা অবস্থার অবস্থা হয়ে একজাতীয় অবস্থার সৃষ্টি করে চেতনার চৈতন্যও সেই মাফিক একজাতীয় হয়ে এগিয়ে চলছে গতির গতির দিকে নিজেকে পরিপূর্ণ করবার জন্য। কিছুদিন আগের ক্লাশেও এ জাতীয় ভাষণ দেওয়া হয়েছিল। বিষয়বস্তু এবং তত্ত্ব বেশী বৃহৎ নয়। একই অবস্থায় ক্রমশঃ ক্রমশঃ অবস্থার অবস্থাকে বের করা। এখানে যে-কোন একটিকে বর্ণনা করতে গেলে ও বিশ্লেষণ করতে গেলে সেই জাতীয় আরও একটিকে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করলে ছ’হাত, ছ’পা, ছ’চোখ, ছ’কর্ণ ইত্যাদি যেমন জীবেরই একজাতীয় বলার মধ্যে রয়ে যাচ্ছে, তন্মধ্যে দিক দিয়েও একজাতীয় ঐ প্রকার। সুতরাং সপ্তচক্রের যে কোন চক্রকে বিশ্লেষণ করলে অর্থবোধ গুরুত্ব-বোধ একই অবস্থায় পরিণত হবে; যেমন দর্পণ—যতপ্রকার চেহারা ই এটার উপর পড়ুক না কেন, প্রত্যেকটি রূপকে যেমন বুঝিয়ে

দিচ্ছে, এই দর্পণমাক্ষিক কাজ বিশ্লেষণে সেইরকম জাতীয়তে সেই প্রকার শাস্ত্রগত সহস্রদল, দ্বিদল এবং নাভিপদ্ম নানারকম পদ্মের বিবরণ রয়েছে এবং প্রতিটি পদ্মের পাপড়িতে পাপড়িতে 'য র ল ব হ ঙ্গ' সমস্ত বর্ণ রয়েছে এবং নানারকম রঙ্গবেরঙ্গ এবং আলোর ব্যাখ্যা রয়েছে এবং নানারকম যন্ত্রের আকার আছে—এই সমস্ত কার্যাবলী অর্থবোধে এনে চিন্তা করলে ফল একজাতীয় হবেই, তবে চিন্তার আগে আগে 'কার্যামূলীয়' পদ্ধতি ঐ সমস্ত বর্ণগুলোকে ধারণ করা পাপড়িতে এই সমস্ত রঙ্গবেরঙ্গের অবস্থার সাথে বোধগম্য করা চিন্তার পক্ষে ব্যাঘাতজনক। তাই প্রত্যেকে কর্মীদের পরবর্তী হতাশ ভাবেরই পরিচয় দিচ্ছে। চেষ্টা আছে, প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু ফলের বেলায় শূন্য। প্রকৃত পদ্ম জিনিষটা কি? পদ্ম যেমন অজস্র পাপড়ির সম্মিলিত, এই ব্রহ্মও সে রকম পদ্মজাতীয় অজস্র অজস্র সূক্ষ্ম অণু সম্মিলিত, তাতেও সমস্ত বর্ণ বর্ণিত। তাই ধ্যানে স্বাভাবিক মতে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় ধ্যান বা চিন্তা করা হয়, তাতেও বিষয়বস্তুর সন্ধান মিলবে। শিশু—যেমন শিক্ষা দীক্ষা প্রথম অবস্থায় তার বুঝাবার মতন কর্মতা থাকে না, পরিবেষ্টনীর চাপে চাপে সে যেমন সব জেনে নেয়, ঠিক শিশুমাক্ষিক সাধকও জানবার সহযোগিতা পায় এই আবহাওয়া হতে ও পরিবেষ্টনী হতে। এই প্রকৃতির নিয়মেই এবং সৃষ্টির

নিয়মাবলীর মতন যেখানে যা ধার্য ও যা ব্যবহার্য, যে ভাবে যা হওয়া দরকার তা যেমন হয়ে আছে, সৃষ্টির সূক্ষ্মতাই যেমন তার ভেতরে সূক্ষ্মের পরিচয় দিচ্ছে—এই বিরাট শক্তিই শিল্পীমাত্তিক যখন যা প্রয়োজন যতটুকু হওয়া দরকার সেই ঠিক ভাবে যা করে আসছে, সেই জাতীয় যে করে যাবে তাকে বুঝবার ও জানবার জ্ঞান। বিশ্বরূপ যেমন তার প্রকাশ, তাকে জেনে নেওয়া তারই প্রয়োজনীয়তা, প্রয়োজনীয়তা পারছি তার সূক্ষ্ম কার্যের কার্যাবলীতে। সুতরাং সাধনমার্গেও তার সূক্ষ্ম কারুকার্যের পরিচয় পাওয়া যাবে আর পাওয়াই যে যাচ্ছে না তা কি করে বলা যাচ্ছে—তাও হয়েই যাচ্ছে। তা না হলে এই চাহিদাগুলো কোথা হতে উদ্ধব হলো? এ প্রশ্নগুলোকে জানতে চাই, বুঝতে চাই; এইগুলোতো সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং তার দ্বারাই চালিত; তা না হলে জীব এই ভাবে একটা যাচঞার মাঝে থাকতো না। এই যাচঞা আদানপ্রদানে ও রূপের বিনিময়ে যে শিক্ষা বিস্তার লাভ করছে, এই প্রভাব সর্ব রূপেই প্রভাবান্বিত হয়েছে, চাহিদাও সেই প্রভাবেরই প্রভাব, চাওয়া-পাওয়া জানা-অজানা জ্ঞান-অজ্ঞান যেমন শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জ্ঞান যেমন চাহিদা, যেমন ‘আমি চাই’ এই অভাবটুকুই পরিপূর্ণ হচ্ছে পাওয়া হলে পেয়েও আবার চাই, পরিপূর্ণও চলছে আবার অভাবও চলছে;—শূন্য, পূর্ণ যেমন দিনরাতের মত কার্য করে যাচ্ছে, এই দিন ও রাত—উভয় উভয়কে

পরিপূর্ণ করতে চাইছে, তাতে আলোও আসছে অন্ধকারও আসছে। এখন এই দুটো আবার একই রূপে অবস্থিত, কেউ কারো ছাড়া নয়। এই চাহিদা ও অভাব ও শূন্য মনে হয় যেন একই গ্রন্থিতে আবদ্ধ; তা না হলে বস্তুকে নাড়াচাড়া করলেই সেই শূন্যতেই গিয়ে অবস্থিত হয়। সুতরাং, এই শূন্য যাকে nothing বলুক আর যাই বলুক, তার একটা influence বা প্রভাব সেটা যেভাবেই হউক হয়ে আসছে, যার জন্ত এই বস্তুগুলো উদ্‌গীৰ্ব হয়ে সেদিকে ধাবিত হচ্ছে। সেই গতি প্রতি বস্তুতে যখন আছে চক্রেতেও আছে, তাই চক্র যখন সৰ্ব্ব বস্তুতে, তখন যে কোন বস্তুকে চিন্তা করাই সেই বিরাটত্বকে লাভ করা, আবার চিন্তা না করে মনের নানা অবস্থা সৃষ্টি করে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয় তাতেও ঐ ফলেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, সেটা যেদিক দিয়েই যাক না কেন—এই কথা আর আগেও ক্লাশে বলা হয়েছিল। সেই চিন্তা ও তার ফল দিয়েই আবার বস্তুকে চিন্তা করা হচ্ছে—ফল মিলবেই। এখন অবস্থা হয়েছে যেমন ক্ষতেতে জ্বালাযুক্ত ঔষধ; জ্বালা স্বাভাবিক, কারণ ক্ষত সৃষ্টি করে ঔষধ প্রয়োগ করছি, জ্বালার উপর জ্বালা উপশমের জগুই। আজ যেই দুর্ভোগে ভুগছি বলে মনে হচ্ছে সেটা ভোগ না উপভোগ সেটা বিবেচনাধীন, আবার ভোগের যে এটা সামগ্রী নয় তাই-বা কে জানে? খাচ্ছি বস্তু বহু সামগ্রী নিয়েই স্তম্ভাচ্ছি করা হয়, ঠিক তেমনি চিন্তা কিংবা ধ্যান ধারণা মন এই অবস্থা সৃষ্টি বা স্বাদ গ্রহণের প্রচেষ্টা, চিন্তা করে ভাল লাগা, ঐ সামগ্রী-

রূপ জ্ঞানাজাতীয় ব্যবহারিক যে ভাষণ—কি সুখ, কি দুঃখ, কি হতাশা, কি নিরাশা ইত্যাদি ঐগুলো মনের সামগ্রী, ধ্যানের সামগ্রী, ঐগুলো বিশ্বাদ করার জন্ত ঠিক বলা যায় না—স্বাদের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্তও তো হতে পারে গোলাপফুল সুমিষ্ট গন্ধময় কিন্তু কণ্টকাক্রান্ত ; স্পর্শে বিদ্ধ হওয়া—সেখানেই সাবধানতা—যেখানেই সুস্বাদু একজাতীয় ফল, আবার কণ্টকাচ্ছন্ন, সাবধানতা অবলম্বনে সেখানেই সুস্বাদু বহির্গত হয়—এই অন্তর সুস্বাদুকে বহিরাগত করার জন্তই এই সমস্ত কণ্টকজাতীয় অবস্থাকে দূরীভূত করা—এই কণ্টকবনে বাস সাবধানতার বাণী সেখানেই তার নিবাস—তুইই এমনিভাবে সঙ্গবদ্ধে আবদ্ধ যেখানে কণ্টক সেখানেই স্বাদ, আবার কণ্টক বিদ্ধ হলে কণ্টকেরই সাহায্য নিচ্ছে। সেখানে স্বাদ এনে তাকে প্রুলেপ দিলে চলবে না—স্বাদের পূর্বাভাষটিও অবলম্বন করতে হবে—সেটাই হলো কণ্টক। আজ যে কণ্টকবনে বিচরণ করছি—কোমল চর্ম্মে নয় সে জাতীয় চর্ম্মে আমরা তা হতে বেছে বেছে খোরাক গুছিয়ে নিচ্ছি তার মধ্যে বাসা খাওয়া সব, সুতরাং যা কিছু হচ্ছে তা হওয়ার জন্তই—ব্যবহারিক ভাষাতে বলা হ'ল, আবার তত্ত্বের দিক দিয়ে হওয়ার জন্তটুকু কিছু নেই হয়ে আছে, বহু আগেও ক্লাসে বার বার বলা হয়েছে, লয় কিনা, তাল্লি যোল মাত্রা যুরে বারবার সোমে ফাঁকে আসতে হয়। আজ যেই দর্শন শ্রবণ ভ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় যেই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যেতে যা যা উপলব্ধি হচ্ছে এই ইন্দ্রিয় আদিতে কোন্

অবস্থায় ছিল, ছিল ঠিকই—কোন আকারে ছিল, আকারগুলো নানা আকৃতিতে অবস্থিত রয়েছে নানা আকর্ষণের মাঝে ; এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এমনভাবে সমভাবে সমতা রেখে চালিত হচ্ছে বা চলছে, গতিই গতি অল্পযায়ী করে নিচ্ছে বা হয়ে যাচ্ছে, যা আজ ইন্দ্রিয়াদিতে পরিণত হচ্ছে, দ্রুত গতির এই ফলই মনে হয় ফলে—আজ যেই চৈতন্য বা চেতনা তাও গতির একটি spring বা machine-মাফিক—machineটি চাষি দিয়ে যেমন ছেড়ে দেওয়া হয়, সেই চাষির প্যাঁচে প্যাঁচে পুতুলের অঙ্গভঙ্গি সেই অল্পযায়ী হয়ে যাচ্ছে, মনে হয় সে স্বেচ্ছায় ঐ সকল করছে যেমন ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে, বিদ্যুৎ চালিত হচ্ছে । এই জীবলোকে চৈতন্যও যে সেই জাতীয়তে যে নেই তা কি করে বলা যেতে পারে, সেই গতির springএর দ্বারাই যে আজ আমরা নড়াচড়া করছি, কথা বলছি, দেখছি, শুনিছি ইত্যাদি সব সেই পুতুল মাফিক, যা হোক, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যখন নামকরণ হয়েছে, সেই নামে চেতনাই হউক আর চৈতন্যই হউক বাই হোক, বলাবলিতে ভাষাতে তো বলা হচ্ছে—তা হতেই যখন মন প্রাণ আত্মা নামে অভিহিত—তা দিয়েই করছি ধ্যান ধারণা ইত্যাদি মনোনিবেশ মনসংযম সব সেখানেই রয়েছে । যোগ যখন আমাদের ধাতস্থ বস্তুতে, মন যখন নিবিষ্ট ব্যাহারিক ব্যবধানে, বলাবলিতে যখন মনসংযোগ করতে হবে, মনোনিবেশ করতে হবে, বস্তুতে ও চক্রেতে সেই হিসেবে মনসংযোগ করলে কি মিলবে—তত্ত্বে যখন মিলিয়েই আছি, ব্যবহারিক

যখন মিলতে হবে, এখন মিলতে বসে গেলাম ও এই যে মন-
 সংযোগ করবো বললাম—এটা কোন সংযুক্ত যুক্ত, একি
 আগেই যুক্ত পরে ভোগ্য, না আগে ভোগ্য পরে যুক্ত।
 চক্ষে ফুটো করে সাথে সাথে মুদ্রিত, না চিন্তা করে মুদ্রিত,
 মুদ্রিতের কার্য যখন চলছেই—এখন আবার চলতে হবে, এখন
 ‘হবের’ মাঝে যখন চলছি, কণ্টক যখন কণ্টকাবৃত, আর একটি
 একটি কণ্টক নিয়ে সেগুলো ছেদনে নামতে হবে—সেটা
 এদের চেয়ে ধারালো হওয়া দরকার। এখন সেগুলো দিয়ে
 এগুলো অপসারিত করতে হবে—এখন আমরা কণ্টকবনে
 নামলাম, নেমে দেখছি পরিধেয় বস্ত্র নেই, কণ্টকের গ্রাসে
 যাওয়ার উপক্রম নিজের অবস্থা শোচনীয়, ধারালো দিয়ে
 ছেদন করতে করতে খুঁজতে আরম্ভ করলাম—সেই
 খোঁজাই হচ্ছে আমাদের to enquire। মনোনিবেশ কর-
 লাম সেই বস্তুতে, এখন ব্যবহারিক চলছে—মনোনিবেশ করে
 দেখলাম মন কিছুতেই বসছে না, এখন তাহার স্বাভাবিক
 ধর্ম এদিক ওদিক করে বেড়াচ্ছে—যেমন মনসাবক্ষ বপন
 করলাম—একটি হলো শতমুখী কণ্টকযুক্ত, কণ্টক ছেদন করতে
 লাগলাম, যেখানে ছেদন সেখানেই আবার কণ্টক, ভেতরে
 ছেদনে নামলাম, ছেদন করে বাইরে ফেললাম, ফেলতে
 ফেলতে সমস্তই কণ্টকাবৃত। আমার যাওয়ার রাস্তাটিও
 কণ্টকচ্ছন্ন, তা স্বাভাবিক; কারণ আমি কণ্টক ছেদনে
 নেমেছি; কারণ কণ্টকবনে মনোনিবেশে এত কণ্টক কি ভাবে

সম্ভব, আর বুদ্ধির চিন্তাতে মনোনিবেশ করিতে মনের একাগ্রতা
 সেখানে এমনি ব্যয় হয়ে যাচ্ছে যে বনের পর বন, তারপর
 আচ্ছন্ন, সেই আচ্ছন্ন—নিজেও আচ্ছাদিত, এখন আমি
 কোথায়, কাজ আমার সফল, আমি কণ্টকসাধনায় নেমে-
 ছিলাম, কণ্টকাক্রান্ত করে আমি সফলতা লাভ করলাম ; চক্র-
 সাধনাও এই জাতীয় সাধনা, মনোনিবেশ করতে বসলাম,
 বিক্ষিপ্ত চিত্ত নিরোধ করতে লাগলাম। একবার বিক্ষিপ্ত,
 একবার নিরোধ,.....বুদ্ধি অবশ্যস্তুাবী। যাক্ সে কথা।
 এখন ধ্যান করতে হবে, যোগ করতে হবে, যোগাসনে
 উপবেশন করতে হবে, নানা আসন নানা অবস্থার অনুশলন
 করতে হবে, মনকে একাগ্র করতে হবে, কিছুকে স্মরণ
 করে তাতে যে ফল না হবে তা নয়, ফল ঠিকই হবে। বিষয়-
 বস্তুতে মনোনিবেশ করলে তত্ত্ব আসবে। তত্ত্বে বিক্ষিপ্তই
 পাও আর স্থিরতাই পাও, তত্ত্বসার বাদ দিয়ে অসারই
 পাওয়া, সবই যখন সার, তবে তত্ত্বজ্ঞরা এদিক দিয়ে bene-
 fitted, যা কিছু পাওয়া সবই সার। তাই একদিক দিয়ে
 রক্ষা, তা না হলে অনুবিধায় পড়তে হতো। তাই তত্ত্ববিদরা
 লেখনীর লেখাতে তাদের মত বাদ দিয়ে যেতে পেরেছেন, তবে
 মার্কিক মার্কিক অনুযায়ী আসবে। তত্ত্ব এমনি জিনিষ—বস্তুর
 বস্তুতে ভরপুর হয়ে মার্কিক মতই আসবে। বলতে বলতে
 আর একদিকে যেতে হবে—চক্র এখন কোথায় ?

In general wayতে বা সাধারণ ভাবেতে এই বস্তুত্ব-

সম্পর্কে ও চক্রসম্পর্কে বলা হয়েছে, ব্যবহারিক একটা বিষয়-বস্তুকে নিয়ে আলোচনা করলে তার তত্ত্বে মনোনিবেশ করলে কি কি হয় তা বলা হচ্ছে; যেমন—কায়াতে অশুস্থতা, সর্ব কায়াই affected, অশুস্থতাটি বুঝে যেমন ঔষধ প্রয়োগ, তার যেমন মুখ দিয়েই করা হচ্ছে, রোগ বুঝে যেমন ঔষধ, তত্ত্বের দিক দিয়ে সবকিছু নিয়েই সব। এখন একটু আলাপ করে ব্যবহারিক জগতে যা যা ব্যবহারিক আছে, সে জাতীয় ভাষণে কি রোগ, কি ঔষধ, ঠিক ব্যবহারিক হিসাবেই বলা হইবে, অনুভূতিসম্পর্কে বলা হবে। যেমন শোকে তার যেমন বারণ, যেমন দুঃখ তার যেমন নিবারণ—সবই ব্যবহারিক ভাষা বুঝ দিয়ে যেমন প্রলেপজাতীয় কার্য করা হচ্ছে, তত্ত্বের দিক দিয়ে গেলে কোনটাতেই কোন কিছু নেই। তা এখন থাক—এখন ব্যবহারিক কি কি উপলব্ধি হয় না হয়, কি কি সবকিছু এই মাফিক একটু আলোচনা করা হবে। কারণ, ব্যবধানীরা ঐ ব্যবধান জাতীয় অবস্থায় তত্ত্বকেও ব্যবধান করে দেখতে চাচ্ছে, সমূহ সমূহের মধ্যেই বলতে হবে। ব্যবধান তো আর ব্যবধান নয়, আর ব্যবহারিকরা ঐ ব্যবধানেরই সামিল। এখন চক্রে একাগ্রতা ও মনোনিবেশ করলে কি কি ফল হয়? কোন চক্রে কি কি হয়, তাই ব্যবহারিক আলাপে ব্যবধানে, যা যা ব্যবহৃত, তাই বলা হচ্ছে; কারণ, এখানকার রূপ বিষয়বস্তু ব্যবহারিক দিয়েই বুঝাবুঝি চেষ্টা, তা হতেই এক জাতীয় উপলব্ধি হচ্ছে—জল ঠাণ্ডা ও গরম, বাতাস প্রবল ও ধীর,

ভাবে নানারকম বৈষম্য—সবই যখন এই ব্যবহারিক দিয়ে বুঝা-
বুঝি চলেছে এবং উপলব্ধি চলেছে, তার ভেতরে ভালমন্দ
বিচার করা হচ্ছে এবং তত্ত্ব সেখানে বসছে এবং তা দিয়ে
যোগধর্ম বিচার করছে। সেইভাবেই এখন কিছু আলোচনা করা
হবে। তাদের নিকট সপ্তচক্রও সেই জাতীয়, যে জাতীয় এই
রূপ-মাঝে রূপে দেখছে এবং তা হতে যা যা গ্রহণ করে এক-এক
জাতীয় মন্তব্য ও ভাষণ দিচ্ছে এবং তাদের মন্তব্য এখন এই
ব্যবহারিকের উপর নির্ভর করছে। তাদের চক্র-অনুভূতিও
এই মন্তব্যের মধ্যে এবং সে অনুভূতিও যখন রয়েছে, সেই অনু-
ভূতিসম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। তার কারণ, স্রোগটি
যে রকম, ঐষধিও প্রয়োগ সেই রকম, তারপর যা হয় হবে।

মূল্যধার হতে সহস্রারের চক্রাদি ব্যবহারিক দিক দিয়ে
যা নির্মাণ করছে, তার মধ্যে আজ্ঞা চক্র, যার নাম, দ্বিদল—
সে-সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। দ্বিদল—দুই অঙ্গ মাঝে-
খানে চিন্তা করা, প্রকৃত দ্বিদল মেরুদণ্ডের উপরে, মস্তিষ্কের
পশ্চাদ্ভাগে, মেরুদণ্ডের চার আঙ্গুল উপরিভাগের মধ্যে
দ্বিদলের চিন্তা। চিন্তার প্রথম সূত্রপাত অঙ্গ মধ্য
হতে তাই গিয়ে পৌঁছেছে সেই ভাগে, তবে মস্তিষ্কের
ভেতরে সাধারণতঃ যে সমস্ত অংশগুলো আছে তা স্বাভাবিক
মতে খুব sensitive parts এবং তা বহু রকম কারু-
কার্যের দ্বারা গণ্ডিত। এত অজস্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীর সম্মিলিত
যে যা-কিছু যখন চিন্তা করা হয়, ঐ চক্রে মস্তিষ্কে যে brain

ও matter একই সূত্রে এমনিভাবে কার্য্য করতে থাকে, মনোনিবেশের সাথে সাথে একজাতীয় sensationএর উৎপত্তি হ'তে থাকে। Secretion অর্থবোধে উপকারিতায় আসে—কদর্থে কদ্ উপকারিতা, সদর্থে সদ উপকারিতা, প্রতি যুহুর্ভে আমার একটি কথা বলতে হচ্ছে, ব্যবহারিক দিক দিয়ে বলা হচ্ছে, তত্ত্বের দিক দিয়ে অত্য রকম—অর্থবোধে যার যত বেশী বিরাটত্ব, তার তত বেশী সেইভাবে secretionএর উদ্ভব। সে-গুলো কি হয়? এর আগেই একটি কথা বলা দরকার—উত্তেজিত অবস্থার নিবৃত্তিই যেমন সৃষ্টি—তাও যেমন পাত্র-পাত্র ভেদে অর্থবোধে ও চিন্তা ভেদে—উত্তেজনা ও নিরুত্তেজনা নির্ভর করেছে। ভেদাভেদ পাত্র অনুযায়ী ও সৃষ্টি সেইভাবেই হচ্ছে এবং তাতে যে secretion, তা একভাবে না একভাবে ব্যয় হবেই এবং বের হবেই; এও ঠিক তাই—বাহির হবেই সেই বাহিরটি কি প্রকার?

বাহিরটি হলো—অর্থবোধ হচ্ছে, বিরাট চিন্তা হচ্ছে, তেজ বিরাটকে তেজোময় করে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে চন্দ্র সূর্য্য, তার একটি রূপকে নিয়ে তার ভেতরেই তাকেই সেই প্রতীক করে দ্বিদলে চিন্তা করতে থাকে, সেই চিন্তাতে ঐ জাতীয় অবস্থা-গুলো সমস্ত মস্তিষ্কের ভেতর এবং কারিকুরির যতরকম নাড়ী ইত্যাদি আছে নামকরণে সমস্তের ভেতর secretion প্রবাহিত হ'তে থাকে। Secretion প্রবাহিত হলে একটা উত্তেজনার অবস্থা সৃষ্টি হবেই এবং একটা চিন্তার সাথে সাথে একটা সঙ্গম

হয়ে যায়—সেই সঙ্গমই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের মত আরও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বাহ্য ইন্দ্রিয়ের মত জাগরিত হয়ে উঠে, তখন তাদের উপযুক্ত বিধান না করলে বা খোরাক না যোগালে—ক্ষুধা লাগলে না খেলে যেমন অপকারিতা, ঠিক সেই অপকারিতা সাধন হয় সেই অবস্থাতে, তবে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে যে সমস্ত ক্ষুধা জন্মে, তা যেমন বাহ্য বস্তু দ্বারাই গ্রাহ্যে এনে নিবৃত্তি করা হয়—চিন্তার দিক দিয়ে এবং মনোনিবেশের দিক দিয়ে এবং ঐ অর্থবোধে যেই চিন্তার প্রবাহ প্রবাহিত হতে থাকে, তাতে যে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সেই ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় যে চিন্তার দ্বারা যেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিলো করানো হয়েছিলো সেই বস্তুটি স্বেচ্ছাসমস্ত secretion ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুপরিমাণ তা পেয়ে তা নিয়ে তারাও সেই চিন্তাযুক্ত হয়ে চুস্তকত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে সেই দিকে, যেই দিকে চিন্তা করে যা চিন্তা করে সেই প্রতীককে নিয়ে প্রতীকের দিকে একমুখী হয়ে তারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে থাকে। যেমন এই শূন্যেতে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহাদি যে রকম অবস্থিত, তারা যেমন প্রত্যেকের সঙ্গে দূরত্বে থেকেও আকর্ষণে আবদ্ধ, এই আকর্ষণ যেমন সরবরাহ করতে থাকে শূন্যের ভেতর দিয়ে, ঠিক এও তেমনি সরবরাহ করতে থাকে সেই বিদ্যুৎ সেই আকর্ষণ, যেই চিন্তার দ্বারা তারা চিন্তাযুক্ত চুস্তকত্ব হয়ে এক-একটি গ্রহের মতন থেকে তারাও সেই প্রতীক, সেই তেজকে আকর্ষণের দ্বারা এনে সংযুক্ত অবস্থার ও সঙ্গম অবস্থার যে ফল, সেই ফল পেয়ে

শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর বাণী-সংগ্রহ

যাচ্ছে সেই ব্যবধানেও, আবার বাহ্যিক দিক দিয়ে যে ব্যবধান দৃষ্ট হয় বস্তুতঃ ব্যবধান ব্যবধান নয় অন্তর্নিহিত ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশের পর অংশ এমনি সংশ্লিষ্ট ও সংবদ্ধ—ঠিক তারের মতন। সেই তারের ভেতর দিয়ে শক্তি প্রকাশিত হয়ে একই শক্তির বিকাশ করছে, তাই বিকশিত অবস্থায় তারা প্রস্ফুটিত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা অনলক্ষণীয় বলে, তাই সেই লক্ষ্যের দিকে একমুখী হয়ে এক চিন্তাতে মগ্ন থেকে ওর সমকক্ষ ও সমতুল্য অবস্থায় পরিণত হয়। তারপর সাধক চিন্তা করতে করতে এমন একটি অবস্থায় পরিণত হ'তে থাকে যখন সেও সে অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নদীর পাড়ে বহু বালুকণা থাকে, নদীর জলের স্পর্শে স্পর্শে যেমন সমস্ত বালুকাময় জলময় বারিময় হয়ে যায়—এ-যে স্পর্শে স্পর্শে আর একটিও তারই সমকক্ষ করে নেওয়া—এটিই হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই নিয়মে এও যে ঠিক তাই, সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম অণুপরমাণুগুলো তেমনি সেই চিন্তাবৃত্ত চুম্বকত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তার ঘর্ষণে স্পর্শনে তার আকর্ষণে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অণুর পর অণু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, তারপর আরও এইভাবে এইভাবে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে যে সমস্ত কার্যা বিদ্যমান আছে—সমস্ত কার্যা একই অবস্থায় পরিণত ক'রে তখন দেখা যাবে সেই অন্তর্নিহিত সুপ্ত—সাধকেরা প্রাণপণ প্রচেষ্টা দ্বারা সেই সুপ্তকে জাগরিত করার প্রয়াসে যে আগ্রহ, তন্ময়তা ও ব্যাকুলতার প্রকাশ করছেন, একদিন দেখা যাবে সাধক, তিনিও সেই

স্বপ্নের সাথে একই সুরে সুর দিচ্ছেন এবং এই সাধক ঐ নির্বিকল্পই হ'ক মুক্তিই হ'ক, ঐ বিরাটকে উপলব্ধি করার জন্য আর নিজে সেই হুওয়ার জন্যই হ'ক যাই হ'ক, কিন্তু ব্রহ্ম সম্পর্কে সমস্ত বিষয়বস্তুতে এমনি একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়, ঐ glass যার উপর ফেলা যায় তখনই সে বিষয়বস্তুর রূপ ও স্বরূপ এসে পড়ে, তখনই স্বরূপত্বের পরিচয় হয় ; তাতেই বাহ্যিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে শিবশক্তির মিলিত অবস্থা এই অবস্থায় দর্শিয়ে গেছেন তত্ত্ববিদ্রা শিবশক্তির প্রকৃতি পুরুষের মিলিত অবস্থা। সেই সহস্রদল সহস্রারের সহিত মনসংযম করলে বিরাটের সহিত সঙ্গম এমনিভাবে হতে থাকে, মনে হয় যেন চিরসঙ্গমে রত—সেই সঙ্গমের একটু আভাস ও নমুনা বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যেতে, তাতেই জীব উন্মাদনায় ব্যস্ত। সেই বিরাট স্বাদ যখন উপলব্ধিত হবে, এই নমুনা তখন ছেঁড়া নেকড়া মারফিক হবে। আজ ভিখারীর যত নেকড়া কুড়িয়ে কুড়িয়ে শত তালি মেরে জীবনকে ধন্য মনে করেছে। কিন্তু নেকড়া মারফিক আবার এই নমুনা দিয়েই বিরাটকে জানা এবং বিরাট এই factory তার মাল সরবরাহ করা, এই নমুনা দিয়েই অনুসরণ করে যাওয়া, তাই গ্রাহ্য বস্তুর এতটুকু স্বাদেই এত কলহ, এত অহঙ্কার, এত মান, অপমান। কিন্তু বিরাট সঙ্গমে যখন সাধক দিনরাত অহর্নিশ থাকবে—সাধকটি কম শয়তান নয়, এখানে আর কিত, তারা সবচেয়ে পাকা, তাই চিরসঙ্গমে রত, শিবশক্তি মিলিত সেথায়,

তাই মঙ্গল তথায়ই বিরাজিত চির যোনিতে আবদ্ধ, প্রকৃত পুরুষ মিলিত সেথায় ; দ্বিদল আর সহস্রদল—সাগর ও নদীর সঙ্গম অবস্থা ; সাধক—নদীর শেষ অবস্থান সাগরের প্রথম অবস্থায় ধরি ধরি ভাব—এমনিভাবে সমস্ত চক্র একই সূত্রে রয়েছে আবদ্ধ। তারপর সেখানে আরও অনেক বিভাঙিত—বাহু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে কি কি নমুনা পাওয়া যাচ্ছে তা দেখেই... আগে দেখে নেওয়া দরকার। সাধক সেখানেই সেই বস্তু বহু আকারে বহুভাবে পাচ্ছে—ভাব বুঝে যেমন ভাব বুঝতে পারে, কথা বলে যেমন কথা বুঝিয়ে দিতে পারছে, চক্ষে দেখিয়ে যেমন দর্শিয়ে যাচ্ছে, সাধক সেইখানেও দেখছে, সেইখানে পাচ্ছে অন্তর্য্যামিত ও ব্যাপ্তমান অবস্থা, অষ্টশক্তি সম্মিলিত অবস্থায় করজোড়ে তার আদেশ পালন করছে। সাধক বসে বসে হুকুমজারী করছে 'ঐ দিকে যাও, আর সে-দিকে যাও,—আজ বাহু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে শত তাগাদায় তাগিদ দিয়েও যেমন পারা যাচ্ছে না তার তুলনায় অন্ধ মারফিক, বাহু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে অন্ধটি যেমন তোমার কাছে লাগছে, সাধকের কাছে এই জগতকে তেমনি মনে হচ্ছে। সাধক সেই অবস্থায় উপবেশন করে যে রাজ্য ভোগ, যে বিরাট শাসনের শাসনকর্তা হিসাবে পালন করতে থাকেন সেই পালনই হচ্ছে শাসন, আর যখন তাকিয়ে দেখে বাহু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে যারা কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঘরে ঘরে ভিক্ষার বুলনা নিয়ে দ্বারে দ্বারে মাগছে আর উন্মাদনায় কাঁদছে—কান্না করছে ক্ষুধার তাড়নায়।

সাধক বলছেন, “হে ভিখারী, তুমি আত্মনাশ করছ কোন অবস্থার জন্য?—ক্ষুধার আবেগে এই ক্ষুধা চির ক্ষুধার আভাস মাত্র। তুমি বুলনা দিয়ে এই ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে পারবে? এই ক্ষুধাকে নিবৃত্তি করতে হলে আবৃত্তি কর বিরাটকে—এই ক্ষুধার আবেগে তুমি এমনভাবে ক্ষুধাকে নষ্ট করো না। জীবন তোমার এমনভাবে বয়ে যাচ্ছে ‘ক্ষুধা ক্ষুধা’ বলে; কিন্তু এই ক্ষুধার সাদা শুধু কায়াতে ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নয়, এটা অন্তর্নিহিত সুর। সেই সুর বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য প্রকাশিত, তুমি বুঝ না বলেই যা গ্রাহ্য পরিণত করতে চাইছ—এই চাওয়া চাওয়া নয়, আবার চাওয়াটা তোমার ঈর্ষা আছে, এই চাওয়া বিরাট চাওয়ার নমুনা। তাই তুমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্যে আছ, সত্যের উদ্ভাদনায় আছ, ভুলে গেছ নিজেকে—সিংহ ভেড়ার দলে থেকে সে ভুলে গেছে নিজেকে, সিংহ হত নষ্ট হয়নি, ভুলে যাওয়ার মাঝে শুধু ঘাস খাওয়া। তুমিও কিন্তু তাই বুলনা নিয়ে মাগছো—এই মাগা মাগা নয়—দেখবে তোমার এই মাগা কোন চাওয়ার সুর এবং এই ক্ষুধা কোথা হতে আগমন—এই চাওয়া পাওয়ার মাঝে তুমি এগিয়ে যেতে থাক—তার জন্য যাত্রিকের station, সেই station এ গিয়ে ticket কেটে বসে থাক, গাড়ী যখন আসবে, কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে দেবে—ধৈর্য ধর। তাই চক্রে মনোনিবেশ করা, আর টিকেট কাটা গাড়ীতে উঠা একই কথা, আর লাইন মার্কিং চলে যাওয়া কেন্দ্রস্থলে পৌঁছা—আর এই দ্বিধা

কেদ্রই হোক, সহস্রীর কেদ্রই হোক চিন্তাতে মগ্ন থাকলে ঠিক পৌঁছে দেবে সেই কেদ্রস্থলে, তখন দেখবে কোন চাওয়া ও পাওয়ার মাঝে তুমি চেয়ে চেয়ে ঘুরেছিলে—কোন সূপ্ত নিনাদ এতদিন সূপ্তভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যেতে, তখন তুমিও অবাক হয়ে যাবে এই সূক্ষ্ম শিল্পীর কার্য্য কতই না মধুময় ! তুমি সেই মধুময়ের ধ্যান করছ, সেই শিল্পীর ধ্যান করছ, সেই সূক্ষ্মকারীর ধ্যান করছ এবং তুমিও যে সে, তোমাতেই যে সে তখন বুঝবে। ব্যবহারিক দিক দিয়ে এই কথাটি বলে গেলাম, তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে অর্থ একই হয়ে পড়ে, শুধু একই খাণ্ডকে বিভিন্নভাবে তৈরী করে দেওয়া, রাঁধুনী যেমন রান্না করে।

আর কি হয় ? আরো অনেক হয়। এই বিশ্ব বিরাটের সমস্ত শক্তিগুলো প্রবাহিত হতে থাকে, বস্তুতেই প্রবাহিত ; বস্তু—তাও অজস্র অজস্র বস্তু সম্মিলিত নিয়েই যখন বস্তু, তাও এখন অগণিত, প্রবাহিত তার ভেতর দিয়েই—প্রকাশিত তাতেই। চক্রেতে সেই সমস্তই বিद्यমান, তারা মন-খোরাকে এগিয়ে যেতে থাকে, তারা মনোবোধ্য ; উদ্ভিদ যেমম রশ্মি খেয়ে থাকে, আরো খায়, এরাও ঠিক চিন্তাও মন খেয়ে ভরপুর হয়ে থাকে। তাই চিন্তাশীল যত বেশী চিন্তা করেন, ওরাও তত বেশী উৎসবের মত এগিয়ে যেতে থাকে, কিন্তু ভেজালযুক্ত হলে তাদের খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়। সাধক যখন ধ্যানে থাকেন রত, সেই গভীর অর্থবোধে তা-ই তাদের উপযুক্ত

ভোগ্য বস্তু। যত বেশী গভীর তন্ময় থাকিবে নিমন্ত্রিতরা তত বেশী এগিয়ে এসে তা গ্রহণ করবে। এই মনোমুগ্ধতার মন অনুযায়ী অণুগুলো অনুসরণ করে যাচ্ছে সেই অণুর জন্তু। মন সর্ব বস্তুতেই বিদ্যমান, ইন্দ্রিয় তথায়ই; সুতরাং, একভাবে না একভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকেরই যখন খোরাক, বাহ্যেতে যখন দৃষ্ট হচ্ছে, এই বাহ্যেতে দৃষ্টেতে সেই প্রমাণে প্রমাণিত—স্বপ্নেতেও তাই চলছে। আগেই বলা, বাহ্যেতে যা গ্রাহ্য ও দৃষ্ট স্বপ্ন, ইন্দ্রিয়েতেও তাই, মনেতে যে অণু বিদ্যমান তা গ্রহণ করে যারা আছে, এরা যাদের খোরাক ঠিক এখানেও বাহ্য বস্তুতে যা দৃষ্ট হচ্ছে এক জাতীয় খোরাকই হয়ে যাচ্ছে—এখানেও তাই খাওয়া হচ্ছে। স্বপ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে একজাতীয় অণুমাফিক কার্য এই জীবলোকেও করছে। তাই জীব অণুতেই প্রতিষ্ঠিত, তাই চিন্তার প্রথা, পদ্ধতি ও নিয়ম সেখানেই will-force নামে আখ্যাত। যত বেশী একাগ্রতা তত বেশী নিমন্ত্রিতদের আগমন—সঙ্গবদ্ধ সেখানেই। এই বিস্তীর্ণতার মধ্যে যেভাবে বিরাজ করছিল, তারা সঙ্গবদ্ধ হয়ে একই জায়গায় কেন্দ্রীভূত হল। তাই এই দ্বিদল কেন্দ্রকে কিংবা সহস্রদল কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীভূত করার জন্তুই এই ধ্যান। তাই ব্যবহারিক জগতে নাম ভেদে সপ্তচক্র নামে অভিহিত এবং অর্থবোধও ‘সা-রে-গা-মা’র সুর অনুযায়ী বিভিন্ন রকম সুর—সেই অক্ষরে সব সুর নিয়ে হয় একটি সুর—এই চক্রও ঠিক তাই। বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থে ও বর্ণে

৩৯

শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর বাণী-সংগ্রহ

বিভিন্ন সাধকেরা সাধনা করে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হতে আরম্ভ করলো; তার কারণ আছে—এক চক্ষু বুজে যেই বিষয়বস্তুর যেটুকু দেখা যায়, দুই চক্ষু দিয়ে দেখলে আর একটু বেশী দেখা যায়। এক চক্ষে যেমন তার পাশের জিনিষ দেখছে, অপর পাশের জিনিষ দেখতে যেমন তার অশ্ববিধে হচ্ছে, এই বাঁধা যেমন তার নিজস্ব একজাতীয় সাধা, তা যেমন ইচ্ছা করে হ'ক, জোর করে হ'ক এই রকম এক চক্ষু মুদ্রিত করে এক চক্ষু দিয়ে যেমন দেখা, এই চক্রাদির বেলায়ও তাই। অর্থবোধে ও চিন্তা করে সব জায়গায় একই যখন, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বর্ণ দেখবার কি আছে এখানে? ঐ নিজে তৈরী করে এক চক্ষু মুদ্রিত করে আছে বলেই বিভিন্ন অবস্থার দর্শন ও অনুভব—এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড একত্র করলে কিন্তু অখণ্ড রূপেরই হয় বিকাশ। তাই প্রকারান্তরে কেন্দ্রস্থ অবস্থায় জীব ধ্যানস্থ আছে বলেই সেই সুপ্ত শক্তি বা দৃষ্ট হচ্ছে বা দৃষ্টে আসছে ঐ কেন্দ্রে যে ধ্যানস্থ, তাতেই রেখেছে জীবন্ত। এত বড় বিরাট শক্তিকে জীবন্তে যে রাখা—কেন্দ্রে ধ্যানস্থ না থাকলে সম্ভব হতো না। তাতেও যে বিক্ষিপ্ত—রত থাকার জন্য তাই সাধকেরা সদা থাকেন ধ্যানে রত, যোগীরা যোগ করেছেন, আবার তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে যোগী ও সাধক সর্বজীবেরই যুক্ত; যেমন বীজ বপন করলে অঙ্কুর হতে ফুল ও ফল অবধি ফলে—এও ঠিক তাই। সেই মূলধার হতে যেই বীজ বপন করা হয়, সেই বীজ ক্রমশঃ ক্রমশঃ

মনোনিবেশের সাথে সাথে সে তার সাড়াটুকু পেয়ে যাচ্ছে ; তাই অন্ধুর উদ্গম হয়ে ডালপালা ফুল ফলে পরিণত যেমন হয়, এই চক্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলো সেইভাবেই কার্যকরী হয়ে যাচ্ছে। একটি ঘরে ছোট ছোট লৌহকণিকা চতুর্দিকে ছড়িয়ে রাখলে মাঝখানে চুম্বককে ঢেকে রেখে দিলে তারপর ঢাকনি অপসারিত করলে তখন দেখা যাবে এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকণাবৎ লৌহকণা ছিটকে ছিটকে ঐ চুম্বকের কাছে 'এনে উপস্থিত হবে, মনে হবে যেন 'খৈ' ফুটছে। তারা যখন ছিটকিয়ে ছিটকিয়ে আসতে থাকবে, তখন ধূলিবৎ আসতে থাকবে, তখন দেখা যাবে চুম্বক আর দেখা যাচ্ছে না, চুম্বকের উপর চার পাঁচ ইঞ্চি ঐগুলো এসে স্তূপীকৃত হয়ে গেছে, তারাও আবার ওর মাফিক হয়ে গিয়েছে। এই বিরাটকে চিন্তা করে অর্থবোধে এনে মনোনিবেশ করলে সেই মন-অণুগুলো সেইভাবে সেইভাবে হয়ে আনুষঙ্গিকদের ঐভাবে টানবে, তখন দেখা যাবে মন ও বিরাট একই জায়গায় লয়াকারে লয় হবে, তাই হতাশ হবার কিছু নেই। সাধক ও যোগী শব্দটি প্রত্যেকের উপর প্রযোজ্য। এখন প্রচেষ্টা সাপেক্ষ—এই চক্রের ধ্যানে সদা রত থাকলে ও ধ্যান করলে অল্পেতেই তার আভাস মিলে। প্রথম প্রথম যে বিন্ধিষ্ঠ ও ভাল-না-লাগার অবস্থা—সেটা এতদিন করে অভ্যাসে পরিণত। এতদিনকার যে নানা অবস্থার সাথে যে জড়িত সেটাই মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে ঐ সময় উঠবে ; উঁকিঝুঁকি উঠলেই ব্যতিব্যস্ত

হওয়ার কারণ নেই। তার কারণ, জালে মাছ পড়লে যতই লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি করুক, তারা জালেই আবদ্ধ; তারপরে সে উঁকিঝুঁকি মারে উল্লুনে চাপালেও—সেই লক্ষ উল্লুনে গিয়েও দেখায়। দক্ষে শব করে ফেলে দক্ষ, সেই বৈদক্ষে সব উঁকিঝুঁকি দাবানলে ভস্মীভূত হয়। যার যত বেশী উঁকিঝুঁকি তার এই বুঝতে হবে—যে সে তত বেশী চক্রে আবদ্ধ হয়েছে; কিন্তু হঠাৎ ছেড়ে দিলে মুক্তিলে পড়তে হবে। মৌচাকে মধু আহরণ—চুপ করে থাকলে ছলের সম্ভাষণ—ছলের দিকে না গিয়ে হুঁশের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। তাই মধু যেখানে, মক্ষিকা সেখানে—এ যে ঠিক স্তম্ভ পান। শিশু যেমন স্তম্ভ পানে থাকে রত—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেই পানেই তন্ময় না থাকলেও তার গতিতে তা-ই চলতে থাকে, তবুও সে ভরপুর—ভুল করে সেখানেই স্তম্ভ না দিয়ে লোলা দেয় যখন—আজ বেশীর ভাগ সেই অবস্থায়ই দাঁড়িয়েছে। মায়েরাও যেমন সৎ মা হয়ে গেছেন, আদৎ মা আছে কি নেই সেটাই এখন দেখবার মত; কারণ, যার দিকে চাই তাকেই দেখা যাচ্ছে একটি করে চুম্বনি চুষছে। তা দিয়েই ঐ মেয়েরা খুশীতে মুক্ত বায়ু সেবনে বের হয়ে গেছে। পিতা তো আপন ভোলাই বাড়ীতে এসে খোঁজ করছে কোনটি তার ছেলে—বহু সম্ভানের সমাবেশ কিনা—পিতার একটু বিভ্রান্তি ঘটেছে। বিভ্রান্তি সর্ববাদীসম্মত, সবার বেলায়ই প্রযোজ্য। তা কিভাবে প্রযোজ্য—উৎপত্ত্যর্থ যে বৃত্তির নিবৃত্তি, তাতে যে স্থলিত, সম্তান

সেখানেই ভূতে পতিত—গণিতে অংগিত—চিনতে বিভ্রান্তি, সেই বিভ্রান্তির সাড়া জীবতে এখনও বর্তমান ; তবে এও ঠিক কথা—ঐ সাড়াটুকু আছে বলেই সেই সাড়ার সন্ধানে সবাই যাচ্ছে। ঐ সাড়াও সেই সাড়ার আভাস ও নমুনা এর জন্যই একমাত্র রেহাই, না হলে শাস্তি প্রতিপদে, প্রতিক্রমে প্রতি মুহূর্তে, ঐ স্থলিত সর্বভাবেই হয়ে যাচ্ছে—সেটাকেই বাঁধ দিয়ে বৈদ্যুতিক কার্য ব্যবহার করতে হবে, তখনই তো আলোকিত—চক্রে সেই পিতৃমাতৃপদে প্রত্যেকেই অবস্থিত। এখানেই প্রকৃতি পুরুষ মিলিত, তাই জীব ধ্যানে রত, ব্যতি-ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। যোগীরা তো রতি সেবাতেই ব্যস্ত, বাহ্যেতেও তা দৃষ্ট, ইন্দ্রিয়াদিতেও তাই সেব্য, সৃষ্টি নাম তাতেই হয়েছে ধার্য্য, চক্রেতে তাই প্রযোজ্য। এই আবর্তনের মাঝে এই আবর্তনেই চক্রের চক্রী পরিবেষ্টিত—সাধক এখানেই নিবিষ্ট, যোগী এখানেই ধ্যানস্থ, বিরাট এখানেই প্রতিষ্ঠিত।

श्रीशिवशक्ति मठ

श्रीशङ्कर भक्त